ফ্যাশন-পোশাক-আশাক : বাঙালিনীর বদলতি তসবির

যশোধরা রায়চৌধুরী

১.

All these consequences follow from the fact that the worker is related to the product of his labour as to an alien object. For it is clear on this presupposition that the more the worker expends himself in work the more powerful becomes the world of objects which he creates in face of himself, the poorer he becomes in his inner life, and the less he belongs to himself. —কার্ল মার্কস।

গল্পটা রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু করব, না মিশেল ফুকোকে দিয়ে, ধন্দে পড়েছি। শেষ অব্দি ঠিক করা গেল, মার্কস দিয়েই শুরু করি, অন্তত মার্কস আমাদের বাঙালির কাছে তো রবীন্দ্রনাথের চেয়ে কম আপনার নন...অন্তত ছিলেন না এতদিন এখন পরিবর্তনের জমানায় তাঁকে কি আর অত সহজে ত্যাগ করতে পারি?

একজন নারী যখন সাজেন, পোশাক থেকে শুরু করে নানারকম অলংকার, গয়নাগাঁটি, ব্যাগ, জুতো, এখনকার ভাষায় নানা অ্যাক্সেসরি দিয়ে সাজিয়ে তোলেন নিজেকে, তখন সেই ভীষণ সময়সাপেক্ষ, কঠিন কাজটাও কিন্তু এরকমের লেবার বা শ্রম বলে ভাবা চলে। আর সেই শ্রমের যে প্রোডাক্ট, বা ফল, সেটা, অর্থাৎ এক সুসজ্জিত নারীদেহ, সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসে না তার নিজের কোনো কাজেই, কেন-না এই কাজের উপলক্ষ্য হল পুরুষের মনোরঞ্জন। অন্তত এমনটাই বলবে আমাদের দীর্ঘকাল ধরে লালিত পুরুষকেন্দ্রিক বিশ্বধারণা।

উদ্দিষ্ট যে ক্রেতা তথা ভোক্তা গোষ্ঠী, তা শুধুই পুরুষ যদি হয়ে থাকে, তাহলে এই গোটা ব্যাপারটাই নারীকে তার নিজের শরীরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলবে, তৈরি হবে অ্যালিয়েনেশন, নিজের শরীরের সঙ্গে নিজের। আর হ্যাঁ, এটাই বলেছেন বামপন্থী নারীবাদীরাও। আর সত্যিই সে কথাকে অবিশ্বাস করতে পারি না, যদি মিলিয়ে নিতে পারি, নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে।

পাশ্চাত্যে সোশিওলজি অফ দ্য বডি নামে যে বিষয়টির আমদানি ঘটেছে, তা কিন্তু মার্কস থেকেই গতি পায়, কেন-না তিনিই প্রথম লক্ষ করেন, শরীরও কীভাবে হয়ে উঠেছে প্রাতিষ্ঠানিক এক ক্ষেত্র, যার ওপরে নানা উৎপাদন প্রক্রিয়া মনোনিবেশ করেছে, তাকে বার বার বদলে দিতে চেয়েছে। (The body is not only the indirect and unintended result of social relations but the target object of a systematic processing)। এরপর আসরে অবতীর্ণ হন ফুকো সাহেব, তিনি বলেন, ক্ষমতার ক্ষেত্র এই শরীরও, এবং ক্ষমতাই তাকে সাজায়, তাকে পেশ করে সমাজে, বলে দেয়, কীভবে দেখা হবে একটি শরীরকে, কীভাবে তা আলাদা করে নেওয়া হবে অন্য শরীরের থেকে। এই সোশিওলজি অফ বডি বিষয়টি অতঃপর ঢুকে পড়ল বিদ্বজ্জনদের গণ্ডীতে, বইয়ের পর বই লেখা হল তা নিয়ে, আর, অতি সম্প্রতি, এই বিষয় জন্ম দিয়েছে আর এক নতুন বিষয়ের, যার নাম, সোশিওলজি অফ কনজিউমারিজম!

আমাদের এই ক্ষুদ্র কথাবন্ধপ্রচেষ্টা আসলে এই নিরিখেই ইদানীংকার বাঙালি তথা ভারতীয় মেয়েদের সাজপোশাককে দেখার একটা শুরুয়াত বলা যেতে পারে। কিছু কিছু পর্যবেক্ষণও বলা যেতে পারে। প্রবন্ধ বা নিবন্ধের গুরুত্ব আমি একে দিতে নারাজ, পণ্ডিতেরা সেসব কাজ করবেন। নারীর পোশাকের বদলতি তসবির, মানে বদলে যাওয়া চেহারাছবি, এই নিয়েই যদি কথা বলতে বসি, আর কথাটাকে আটকে রাখি বাঙালির মেনস্ট্রিম মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্তের ভেতরে, নিজের অভিজ্ঞতার বলয়টা থেকেও আরম্ভ করা যায় ব্যাপারটাকে দেখতে। আর তখন এটা দেখতে পাই, কী দ্রুতই না পালটে গেল মেয়েদের নিজেকে সাজিয়ে তোলাটা, এই উদ্দিষ্ট ভোক্তা-র নিরিখে।

একটা প্রজন্ম থেকে আর একটা প্রজন্মে, আলাদা আলাদা করে বলে দেওয়া যাবে না, মেয়েরা কার জন্য সাজেন। পুরুষের জন্য, নাকি নিজের জন্য? যদি পুরুষের জন্য হয়, তাহলে কোন পুরুষের জন্য? নিজের প্রিয় পুরুষটির জন্য, স্বামী বা প্রেমিকের জন্য, নাকি তার বন্ধুবান্ধব অন্য পুরুষদের জন্য, নাকি, বাসে ট্রামে দেখা আর আর পুরুষের জন্যও? আর যদি নিজের জন্য হয়, আয়নার সামনে বসে নিজেকে কোন চোখ দিয়ে দেখেন একটি মেয়ে? অন্য চোখে, ধার করা চোখে, পুরুষের চোখে? যেমনটা বলবেন লরা মালভি?

গত অনেকগুলো বছর, অন্তত যে ক'বছর আমি বেঁচে আছি, ষাটের শেষ থেকে সত্তর আশি ছেড়ে নব্বই ও দু-হাজার অব্দি, আমার চোখে দেখা মেয়েদের সাজপোশাক বদলের হার এবং গতি, বদলের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধের পালটে যাওয়া, সব মিলিয়ে যেটুকু দেখেছি তারই আধারে আমার আজকের এই কথাগুলো। আসলে, যাই ঘটে, যখনই ঘটে, জিজ্ঞেস না করে পারি না সেই একই প্রশ্ন, যা জিজ্ঞেস করেছি বার বার গত কয়েক বছরে, আমাদের সনাতন সমাজের নানা রেফারেন্সেই... মেয়েদের কিছু বদল কি হয়েছে আমাদের চোখের সামনে দিয়েই?

আমাদের সব হওয়া, সব বদলই কোথও একটা গিয়ে একসুতোয় গাঁথা হয়ে উঠছে ক্রমাগত। নারীবাদ, পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে সমঝোতা : এ একটা দেখার দিক। বিষয় হিসেবেই কিন্তু নারীকে দেখতে অভ্যস্ত আমরা। জনপ্রিয় সাহিত্য শিল্পের কাছে সেটাই প্রশ্নচিহ্নহীন ধরে নেওয়া। উপভোক্তা নারী পুরুষ যে-ই হোন, তাঁকে আমোদ দেবে, বিনোদন দেবে নারীর এই বিষয়-মূর্তিই। এটাই পুরুষ শাসিত সমাজের সহজ ছক। নারী পুরুষের মিউজ, তার প্রেরণা, তার

আকাঙ্ক্ষার বিষয়, সম্ভোগের বস্তুক সামিল করার পণ্য।

ফ্যাশন ব্যাপারটাকেও আমার দেখতে পারি মেল গেজ-ফিমেল গেজ-এর দ্বৈততার নিরিখে। যে নতুন নিরীক্ষা তুলে ধরেছিলেন সিনেমা চর্চার ক্ষেত্রে লরা মালভে, তাঁর 'ভিজুয়াল অ্যান্ড আদাল প্লেজারস' প্রবন্ধে, ১৯৭৩ সালে। যা থেকে উঠে এসেছিল নতুন এক তত্ত্ব। লার্কা ও ফ্রয়েডের ধারা থেকেই জন্ম নিয়েছিল জনপ্রিয় ছায়াছবির নারীবাদী বিশ্লেষণের নতুন ধারণাটি, 'মেল গেজ' বা পুং দৃষ্টির তত্ত্ব। সে তত্ত্বও বলছে একই কথা। মূলস্রোত ছায়াছবি, হলিউডের বিখ্যাত ছবিগুলিই ধরা যাক, নারীকে দেখায় বিষয় হিসেবে। দুভাবে বিষয় করা হয় নারীকে। হয় ভয়ারিস্টিক বিষয়। সে পুরুষচোখে নারী লালসাময় বেশ্যা। নতুবা ফেতিশিস্টিক বিষয়। সে পুরুষচোখে, পুরুষচাহনিতে নারী দেবী, ম্যাডোনা, মা।

নারীবাদীর চোখ দিয়ে দেখলে এই ব্যাপারটাতে একটা সূক্ষ্ম বদল লক্ষ করব আমরা। আরও সোজা করে বললে, মেয়েদের দিক থেকে পোশাকের সঙ্গে তাঁর নিজ সম্পর্ককে পুনর্নির্মাণ দেখব। অনন্ত আশি নব্বই অব্দি। তারপর দেখব, নব্বই দশকের নতুন দৈত্যকে, প্রদীপের ভেতের যে লুকিয়ে ছিল অ্যাদ্দিন। আশি থেকে যার সলতে পাকানো শুরু। বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, ভোগবাদ। সে আর এক বহুমাত্রিক বল। যে দিকটাই দেখি না, গত কুড়ি তিরিশ বছরে মেয়েদের পোশাক ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সামাজিক প্যারামিটারগুলো পালটতেই দেখি। সর্বত্র ওই এক বদলে যাওয়া মূল্যবোধই উঠে আসে।

আমাদের শুরুর প্রশ্নটা বেশ সাদামাটা ছিল। গত ত্রিশ বছরে কি খুবই বেড়ে উঠেছে বাঙালি মেয়েদের রূপসচেতনতা? পোশাক-আশাক নিয়ে মেয়েরা কি আগের চেয়ে বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন? কথটা বোধ হয় খুব ওপর ওপর হয়ে যায়। এভাবে বললে। অথচ এর চেয়ে বেশি গভীরে ঢুকে, এবং চেয়ে বেশি খুঁটিয়ে, কেউ বা দেখেছেন, মেয়েদের সঙ্গে সাজপোশাকের সম্পর্কের হালফিলের বিবর্তন?

বাংলায় ফ্যাশন নিয়ে বই খুঁজলে যে পাব না তা নয়। তবু, মেয়েদের চোখে মেয়েদের ফ্যাশন নিয়ে বই সম্ভবত বাংলায় নেই। যেমন নেই সৌন্দর্য বা রূপবিভার বিশ্লেষণ। মানে, আমি সানন্দা পত্রিকার কথা বলতে চাইছি না কিন্তু, অথবা বলতে চাইছি না সুখী গৃহকোণ, বা বিভিন্ন সংবাদপত্রের ফ্যাশনপৃষ্ঠার কথা। আমি বলতে চাইছি, সেইসব ফ্যাশন ট্রেন্ডের পুনঃ নিরীক্ষা, ট্রেন্ড অ্যানালিসিস... অথবা তাত্ত্বিক স্তরে কোনো সূত্র খোঁজার চেষ্টা রোজ যা ঘটে চলেছে ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে, মিডিয়ায় তার প্রতিফলন, মানুষের মনের উপরে তার ধাক্কা বা সূক্ষ্ম প্রভাব, তার বলয়ে বসবাস করতে করতে মেয়েদের জীবনযাপনে আস্তে আস্তে যে বদল, এইসব ঘটনার একটা নির্যাস, একটা স্পষ্ট অবয়ব, কোনো আলোচনায় তৈরি হয়ে উঠছে কি? বিষয়টি সমাজতাত্ত্বিকের এলাকা এবং একজন দুজন সমাজতাত্ত্বিকের কলমে ইতিমধ্যেই নজরে এসেছে কিছু লেখায় বদলটাকে ধরার চেষ্টা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপিকার হাতেই এ বিষয়ের সঠিক মর্যাদা হতে পারে, এমন নয় হয়তো বা নারীবাদী বয়ান নির্মাণ না করেও, খুঁটিনাটি তুলে আনা তথ্যনিষ্ঠ লেখাও তো থাকতে পারত!

মনে রাখতে হবে, ক্ল্যামার শব্দটি নিয়ে বইকে-বই লেখা হয়ে গেছে পাশ্চাত্যের নারীবাদীদের কলমে।

ধরা যাক না ক্যারল ডাইহাউজের 'গ্লামার : নারী, ইতিহাস, নারীবাদ' বইটির কথাই। এখানে গ্ল্যামারের সংজ্ঞা দিচ্ছেন ডাইহাউজ। যে গ্ল্যামার, ১৯৯০ সলের আগে ব্যবহারই হত না, হলেই খুব ঝাপসা এক অর্থে। গ্ল্যামার প্রথম যুগে এক যাদুক্ষমতার মতো, পরবর্তীতে ভাষার প্রতি পরতে গ্ল্যামার শব্দের ক্রমবিস্তারে তার অবস্থান বিলাস, ব্যসনে, প্রাচ্য-রেশমের সূক্ষ্ম-দুর্লভতার একজটিক (exotic)-এ, নাটকীয় আড়ম্বর ঐশ্বর্যে। আরও পরে, ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত স্বপ্নকল্পনার উপাদান। হলিউড সিনেমার দাক্ষিণ্যে রোজকার থোড়বড়িখাড়া জীবন থেকে পালানোর উপাদান সেই গ্ল্যামার। যা প্রতিটি মার্কিন রমনীকে উজ্জীবিত করত, তার নিরেশ, নীরস দৈনন্দিন জীবনের নিরিখে আনন্দ দিত যে গ্ল্যামারের খোঁজ জনপ্রিয় ফ্যাশন ও রুচির ক্ষেত্রে সিনেমার প্রত্যক্ষ প্রভাবে ব্যাপারটা মুভি থেকে টকির যুগ অব্দি স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর সবচেয়ে বড়ো যে তফাত ঘটে গেল, তা হল, উচ্চবিত্তের আঙিনা থেকে সফিস্টিকেশন, রূপচর্চা আর পোশাকসচেতনতা নেমে এল মধ্যবিত্তের অন্দরে। অর্থাৎ, সাজগোজ-গ্লামার-পোশাক চর্চার মধ্যবিত্তায়নই সিনেমার সবচেয়ে বড়ো অবদান পাশ্চত্যে, বিশেষত মার্কিন সমাজে।

২. রাবীন্দ্রিক ব্রাহ্ম মডেলে ফ্যাশন : বসবার ঘরের কালচার

বাঙালি যখন, গত ত্রিশ বছরের এলাকা বহির্ভূত হলেও, একবার রবি ঠাকুর ছুঁইয়ে না নিলে দোষ কাটে না আমাদের লেখালেখির। আশ্চর্যের কথা জীবনের ধারা ছোঁওয়া সমস্ত বিষয়ই কোনো-না-কোনোভাবে তাঁর লেখায় বিধৃত বলে, কোটেশন মেরে দেওয়াও খুব সহজ। ফ্যাশন স্টাইল তরজা তাই সেই কবেই রবি-বিষয়ীভূত।

''অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য - বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে। পাঁচজনের মধ্যে ও যে- কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ। স্ফূর্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না; মনটা এমন এক রকমের চকমকি যেন, ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি

সাদা থানের যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলিত নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু-ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি - দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে এর ট্যাকঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কটকি জুতো। বাইরে যখন যায় একটা পাট-করা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজী চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে; বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর এক রকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে, যারা বোঝে তারা বলে— কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিস্‌টিঙ্গুইশ্‌ড্। নিজেকে অপরূপ করবার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত। কোনোমতে বয়স মিলিয়ে যারা কুষ্টির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই, একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে, সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।"

রবি ঠাকুরের 'শেষের কবিতা' বোধ হয় উপন্যাসে বাংলার ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সাজপোশাকের ডিটেলিং-এর এক দিকদর্শন। এভাবে সূক্ষ্ম বর্ণনার ভেতর দিয়ে তুলে আনায় প্রমাণ পায়, সাজ ব্যাপারটা মেয়েদের একচেটিয়া ব্যাপার নয়, এর 'ইউনিসেক্স চরিত্রটা বেশ ফুটে ওঠে। তবে, অমিত চিরকালই একটি ব্যতিক্রম। তবে এর পরই মেয়েদের ফ্যাশনদুরস্ততার বর্ণনা এসে পড়বে, যা আমাদের এই লেখার পক্ষে এক অতি উপাদেয় উপাদান...

''এ দিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাকনাম সিসি এং লিসি, যে নতুন বাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি— ফ্যাশানের পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট-বিশেষ। উঁচু খুরওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা পায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপ্‌টানো। এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি; গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর করে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষবন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।"

এর পরই পাঠক হিসেবে আমাদের তৃষিত অপেক্ষা হবে লাবণ্যের আবির্ভাবের জন্য। সেটা এইরকম...

''একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য-মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে, তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি— চারিদিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দরপর্বতের নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী, সমস্ত আন্দোলনে উপরে— মহাসাগরের বুক তখনা ফুলে ফুলে কেঁকে উঠছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। ড্রয়িংরুমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না। ...মেয়েটির পরনে শরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হাটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমনীয়। জ্যাকেটের হাত কব্‌জি পর্যন্ত, দু-হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের-বন্ধনহীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি কাজ-করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।"

এই যে সাজ, যা বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত উচ্চবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত মেয়েদের, তির্যকভাবে যাকে বলা চলে ব্রাহ্ম সাজ, সেই ফ্যাশনদুরস্ততার পরিশীলিত বয়ান, যতটাই ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সিংক্রনিক, ততটাই বসবার ঘর, বাইরের ঘর, বৈঠকখানার কালচারে চোবানো। একেই বোধ হয় বলে স্যালঁ (salon) কালচার!

যে মেয়েরা হিন্দু অন্তঃপুরে, সেই একই সময়ে, তাঁদের সাজও হয়তো বা উঠে এসেছে শরৎসাহিত্যে অথবা তরুণতর উপন্যাসসাহিত্যের বিবরণে। কিন্তু এত স্পষ্ট ও সচেতনভাবে এসেছে কি? তবে এ কথা বলাই যায় যে বঙ্গ বধূদের ঘরোয়া সাজের ভেতরে সেলাই করা ব্লাউজ (সে যুগের ভাষায় যা জ্যাকেট) সেভাবে কিন্তু ছিল না বললেই চলে। শেমিজ হয়তো বা এসে উঠেছে। ফ্রিল দেওয়া হাতার যে কদর্য ক্যারিকেচারটি আমাদের আজকের সময়ে বাঙালি অন্তঃপুরিকামাত্রের অঙ্গে যে কোনো নাটক বা সিরিয়ালে দেখি, অন্তত ততটা অনান্দনিক ছিল না সেই খালি পায়ে জড়ানো দিশিমতে পরা শাড়ি বা থানের বিশুদ্ধতা।

হিন্দু অন্তঃপুরের ভেতরে রাবীন্দ্রিক বিবরণের ওই জ্যাকেট-সিল্ক শাড়ির সাজ যে কতটা বেমানান ও আরোপিত ছিল, স্বয়ং রবি ঠাকুরই তা কি স্পষ্ট করেননি? 'ঘরে বাইরে' - তে, যখন এই ফ্যাশন গায়ের জোরে আমদানি হয় নিখিলেশের প্রাচীনপন্থী বিধবা বউদির। ...বিমলের কণ্ঠস্বরে তা অনেকটা এইরকম... ''এখনকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা! আমার স্বামী আমাকে হাল - ফেশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন— সেই সমস্ত রঙবেরঙের জ্যাকেট-শাড়ি-শেমিজ-পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্বলতে থাকেন। রূপ নেই, রূপের ঠাট! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুললে গো..." সেই বিমলকেই যখন সন্দীপবাবুর সামনে যাবার জন্য সাজতে দেখা যায় তখন তা এইরকম সেদিন সকালে মাথা ঘষে আমার সুদীর্ঘ এলোচুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ

করে জড়িয়েছিলুম। দুপুরবেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধবার সময় ছিল না। গায়ে ছিল জরির পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজী শাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড়-দেওয়া হাত-কাটা জ্যাকেট। আমি ঠিক করেছিলুম এ খুব সংযত সাজ, এর চেয়ে সাদাসিধা আর-কিছু হতে পারে না। এমন সময় আমার মেজো জা এসে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তার পরে ফোঁটদুটো খুব টিপে একটু হাসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, দিদি, তুমি হাসলে যে? তিনি বললেন, তোর সাজ দেখছি।"

৩. সাহিত্যের পরতে মেয়েদের ফ্যাশন-সমীক্ষা

The body: a surface on which events are inscribed... Genealogy, as an analysis of where things come from is thus situated at the point of articulation of the body and history. Its task is to show a body totally improinted sith history, and history destroying the body.' - Michel Foucaoult.

চলে আসি পঞ্চাশ ষাটের দশকে। কেন-না এখান থেকেই পাড়ি দেওয়া সোজা হবে সিধে সত্তর আশির দিকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বহু লেখায় মেয়েদের সাজপোশাকের বর্ণনা পাই। রবি ঠাকুরের মতো পুঙ্খাণুপুঙ্খ না হলেও, তাতে স্পষ্ট লেখা থাকে একটা দ্বৈততার কথা, সিসি লিসি বনাম লাবণ্যেও যে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। একদিকে আছে অতি চর্চিত, মহার্ঘ, অতি সচেতন সাজগোজের উগ্রতা (পড়ুন - চরিত্রের উগ্রতা), যা নায়িকা নয়, প্রতিনায়িকা অথবা সরাসরি ভ্যাম্পের রোলে ঠেলে দেয় নারীচরিত্রগুলোকে, অন্য দিকে অসচেতন, ঢলোঢলো কাঁচা সৌন্দর্য, যা আত্মার বিশুদ্ধতাকে দেহসৌষ্ঠব ফুঁড়ে নায়কের চোখের সামনে হাজির করছে। নায়িকারা সর্বদাই কিছুটা সাজগোজে অন্যমনস্ক হবেন, এ যেন তারপর থেকে দাঁড়িয়ে গেল বাংলা আইডিওলজির সঙ্গে সমান্তরালে, সাহিত্য শিল্পেও।

দেখা যাক, সুনীলের প্রতিদ্বন্দ্বী-তে কীভাবে এসেছে এই সংজ্ঞায়ন।

''মেয়েদুটির নাম মালবিকা আর কেয়া। মালবিকা তার পায়ের জুতো, শাড়ির রং, আংটির পাথর, হাতব্যাগ, টিপ সব মিলিয়ে পরেছে। চুল বাঁধার ধরন দেখলেই বোঝা যায়, সে এক-একদিন এক-এক রকমভাবে চুল বাঁধে। নিজের রূপ সম্পর্কে মেয়েটি সজাগ। মুখে সেই হালকা অহংকারের ছায়া পড়েছে। কেয়া মেয়েটি খানিকটা এলোমেলো স্বভাবের, পোশাকের পারিপাট্য নেই, কিন্তু মুখখানি তার ভারী সুন্দর - বড় বড় চোখদুটিতে সরল সৌন্দর্য।"

এই বর্ণনা থেকে লেখকের বা তার নির্মিত নায়কের পক্ষপাত স্পষ্ট, বাংলায় এই পক্ষপাত কিন্তু চলবে, একেবারে কালবেলা-র মাধবীলতা পর্যন্ত। বলা ভালো সমরেশ মজুমদারে এসে বাঙালি মেয়ের এই ইমেজ কালমিনেশনে পৌঁছবে। ''মাধবীলতাকে সে চেনে না... শুধু এটুকুই মনে হয়েছে, মেয়েটি নরম এবং বোকা নয়। ...মাধবীলতার নিজস্ব চিন্তাভাবনা আছে, এবং সেটাকে গুছিয়ে স্পষ্ট ভাষায় বলার ক্ষমতা রাখে। এরকম সতেজ ডাঁটো আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলতে কোনও মেয়েকে অনিমেষ দেখেনি। কলকাতায় এসে নীলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নীলা অবশ্যই খুব ডেসপারেট মেয়ে, কোনও রকম ভিজে ব্যাপার ওর নেই। কিন্তু নীলা কখনওই আকর্ষণ করে না, বুকের মধ্যে এমন করে কাঁপন আনে না। যে কোনও পুরুষবন্ধুর মতো নীলার সঙ্গে সময় কাটানো যায়... নীলার মানসিকতা বন্ধ, মাধবীলতার মতো এমন দ্যুতি ছড়ায় না।"

রাবীন্দ্রিক লাবণ্যর থেকে আলাদা হয়েও আসলে কোথাও এক থেকে গেছে মাধবীলতা। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নারীচরিত্র, বহু কলেজ পড়ুয়া ছেলেমেয়ের মতো আমারও কমবয়েসের ফ্যান্টাসির উপাদান সে। সবচেয়ে বড়ো কথা, সে মেয়ে মেয়ে, সে নারী, অথচ নারীর যে অবয়টি আরোপিত সেই তথাকথিত 'ফ্যাশন' - সর্বস্ব নয়, আবার নীলার মতো 'পুরুষালি' -ও হলে তাকে চলবে না।

এখানেও বহাল রয়েছে দৃষ্টিকোণ, অবশ্যই। নির্মাণ যে করেছেন একজন পুরুষই!

৪. সিনেমার ছায়াশরীরিণীরা

Because there is some little room for expression otherwise, a lot of people love cinema because they find it a way of expressing themselves.
Mohsen Makhmalbaf

Cinema has only been around for about 100 years. Has all of the word's violence towards women taken place only within the past 100 years?

এর পরের অনেকগুলো বছর পাশ্চাত্যের ছায়াসঞ্চরণে বাঙালিনীর পোশাক ক্রমশ হয়ে উঠেছে মুম্বাই-অনুগামী। সাহিত্য থেকে আত্মপ্রকাশমাধ্যমটির অনিবার্য পদোন্নতি যদি হয়ে থাকে সিনেমায়, তাহলে সেখানেই খুঁজতে হবে পোশাকরীতিনীতি বদলের চিহ্নগুলোকে, আর একইসঙ্গে পড়ে নিতে হবে মেয়েদের পোশাক-সম্পর্ক, সেই সঙ্গে নিজের সঙ্গে নিজের সম্পর্ককেও!

সিনেমা যখন মেনস্ট্রিম, প্রকৃত অর্থে, তখন সেখানেই পাওয়া সহজ হবে ফ্যাশনের শেষতম বিধিনিষেধ, পাওয়ার প্লে। কেমন ছিল পঞ্চাশের দশকে, ষাটের দশকে ফ্যাশনের হাল হকিকত? অজয় কর অগ্রগামী - অগ্রদূতের পরিচালিত বাণিজ্যিক বাংলা ছবিকে ধরলে বোধহয় পুরুষদৃষ্টির সেই একপেশেমি দেখব, নারী নির্মাণে ভালো খারাপের দ্বন্দ্ব তখনও অবিচল এবং অতি সজ্জিতা বনাম সাদাসিধে সুন্দরীর নতুন সংজ্ঞায়ন তৈরি হচ্ছে।

মুম্বাই -মার্কা শিফন বা সিল্কের সঙ্গে বেনারসি কাপড়ের টাইট ব্লাউজ, শেষত, গ্লামারের শেষ কথা কিন্তু ৫০-৬০ -এর দশকে এটাই। যে পোশাক সুচিত্রা-মাধবী-সাবিত্রীদের করত অতিরম্যা, তেল চপচপে টান করে বাঁধা চুল (হয় বিনুনি নয় খোঁপায় পরিমার্জিত ও অত্যন্ত আঁটোসাঁটো) আর ফ্ল্যাট চটির সঙ্গে। তার সঙ্গে যোগ হত চোখের কাজল টানটোন, কটাক্ষের চমক। কানের ঝোলা দুল, যা সুচিত্রা সেনের প্রায় একচেটিয়া। আর, প্রতিনায়িকার অহংকার আর দম্ভের অনুষঙ্গে এসে পড়ত শাড়িতে জরির অতিরিক্ত উপস্থিতি আর হাতব্যাগের ঠুঁটো ডিজাইন। (যাকে ইদানীং ফিরতে দেখছি ক্লাচ ব্যাগে!)

যদি যাই অলটারনেটিভের খোঁজে, যা নাকি আরও রিয়ালিস্টিক বলেই আমাদের অধিক আগ্রহের বিষয়? ঋত্বিক ঘটকের ছবিতে সুপ্রিয়া দেবীর সাদা শাড়ি ও কালচে কাঁধ ঢাকা ব্লাউজের আটপৌরে জমকহীনতা এভাবে রচনা করতে নতুন একটা বয়ান। যা ফ্যাশনের দর্প চুর্ণ করে দেয়। এ সেই চিরন্তন মৃত্তিকা-ছোঁওয়া মাতৃরূপের স্নিগ্ধ ঘরানা। যা নিজেই এক অনুকরণযোগ্য মডেল।

সত্যজিতের ছবির মেয়েরা আবার এগিয়ে গেছে ছিমছাম পাশ্চাত্য পোশাকের অনুরণনে, 'সীমাবদ্ধ' বা 'মহানগরের' অ্যাংলো মেয়েদের অনুষঙ্গে (ডোর টু ডোর ক্যাম্পেনিং-এর এডিথ অথবা বড়ো সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারির চরিত্রে ফ্রক বা স্লিভলেস ব্লাউজ-শিফন শাড়ি, চলতি ট্রেন্ডের হেয়ারডু লক্ষণীয়) বাঙালি মেয়েদেরও বদল ঘটেছে। মাধবী চক্রবর্তী অথবা শর্মিলা ঠাকুরের পোশাকে এসেছে অনুচ্চারিত চাপা কিন্তু স্মার্ট পোশাক কল্পনা, শাড়িতে হালকা রং হলেও, প্লাউজের কাটে বা বক্ষ আবরণীর ডিজাইনে সাম্প্রতিকতা প্রকট। মহানগরের মাধবীর প্রধান চারিত্র্য ছিল পেছন থেকে দেখা যাওয়া হালকা রং-এর ব্লাউজ থেকে ফুটে বেরোনো ব্রেসিয়ারের রেখা। এটা লক্ষ না করেছেন কোন দর্শক, আর কেউ বা ভুলেছেন, ব্লাউজ আর শাড়ির সন্ধিস্থলে পেন গুঁজে রাখা 'নায়কে'র অদিতিকে।?

অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী-র আপওয়ার্ডলি মোবাইল মেয়ে সুতপা খুঁজে নিয়েছে অফিসে বসে মনোরঞ্জন ও পার্টিতে বল ডান্স করার উপযোগী শরীর কামড়ে থাকা ভয়েলের শাড়ির চটুলতা, যা তার মডেলিং - কামনার সঙ্গে একেবারে মানানসই। সুনীলের বর্ণনায়, মূল উপন্যাসে যে মেয়েটি এইরকম : ''সুতপা এক হাত দিয়ে শাড়িটা একটু উঁচু করে পা টিপে টিপে হাঁটছে। একটা ময়ূরকণ্ঠী রঙের ছাপা শাড়ি পরেছে সুতপা, হাতে একটা সাদা রঙের ব্যাগ। ... তাকে এখন একজন পুরোপুরি মহিলা বলা যায়। সুতপার বুক দুটি ভরাট সুগোল, হাঁটার ভঙ্গিতে খানিকটা মাদকতা মাখানো, ফসাঁ মুখটাতে একটা অন্যরকম আভা।'' পুরুষের নির্মিতি হলেও, নিজের অজান্তেই সুনীল কিন্তু ভেঙে ফেলেছেন ছাঁচ, ব্যবহারহীন একরকমের আত্ম-পরিতৃপ্ত চরিত্র হিসেবে সৃষ্টি করে ফেলেছেন সুতপাকে, সত্যজিৎ যাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছেন, ছাতে, একলা একলাই, কাল্পনিক পুরুষ সঙ্গীর কাঁধে হাত রেখে নেচে চলতে।

এখানে কিন্তু স্পষ্টই দেখতে পাব একটা ব্যাপার। মার্কস সাহেবের চোখ দিয়ে না দেখলেও, সহজেই আমাদের চোখে পড়ে যায় এই তথ্য, যে, মেয়েদের সাজগোজের ব্যাপারটা আর রাবীন্দ্রিক যুগের মতো দৃষ্টিনান্দনিকতায় নিছক আবদ্ধ থাকছে না, অন্যভাষায় যাকে বলা যায প্রিয় পুরুষটির মনোরঞ্জনের জন্যই সাজ (সে হোক নিখিলেশ অথবা সন্দীপ, পুরুষকে উদ্দিষ্ট করেই ঘটেছে ঘটনাটা)। বরঞ্চ ঘরের বাইরে বেরিয়ে পেশাগত স্তরে কোনো-না-কোনো কাজের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সাজার ব্যাপারটা এসে পড়ছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা জরুরি উপাদান হিসেবে। ব্যক্তিত্বনির্মাণের উপাদান।

মানে, অন্য এক ক্ষমতার ক্ষেত্র হয়ে উঠছে নারীর শরীরটি।

মেয়েরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন ৫০-৬০ -এর দশকে। গৃহবধূর পাট্টাভাঙা 'পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর' -এর ছাঁচ ভেঙে বাধ্য হয়ে রুজি রুটির জন্য পথে নামছেন। সঙ্গে সঙ্গেই, ফ্যাশনের একটা কেজো, প্রাগম্যাটিক, ব্যবহারমুখী মধ্যবিত্তায়ন ঘটে যাচ্ছে। সেই মধ্যবিত্তায়নের বয়ানের ভেতরেই ধরা থাকছে 'মেঘে ঢাকা তারা' অথবা 'কোমল গান্ধারে'র পার্টিশন-তাড়িতা নায়িকা আটপৌরে কিন্তু কর্মঠ পোশাক (সাদা শাড়ি, সঙ্গে ঝোলা) টিপিকাল হয়ে উঠেছিল কেরানি / স্কুল শিক্ষিকা/ অধাপিকা / অবিবাহিতার। মধ্য ও নিম্ন মধ্যবিত্ত মায়ের ছিমছাপ পারিপাট্য ও সাদাসিধে বেশবাসের একটা প্রোটোটাইপ তৈরি হয়ে উঠেছিল, বা উঠেছে। অন্যদিকে সাহেবি কোম্পানি অথবা নবলব্ধ স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে ভারতীয়দের জমানার নতুন নতুন সব পেশা এক্সপ্লোর করতে আসা মেয়েদের (বাড়ি বাড়ি সেলাই মেশিন বিক্রি করা, যার ভেতরে প্রতিনিধিত্বপূর্ণ কাজ) ভেতরে নতুন নতুন পণ্য ব্যবহারের ঝোঁক ও ঝুঁকি (মনে করুণ মহানগরের লিপস্টিক ঘটনা, অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীর বসের স্ত্রীর বাড়ি বয়ে এসে কুৎসা গেয়ে যাওয়া) বাড়ছিল।

৫. বোকা বাক্সে বিধান

"It is on them that the universal reign of the normative is based; and each individual, wherver he my find himself, subject to it his body, his gestures, his behavior, his aptitudes, his achivements."

-Michel Foucault, Discipline and Punish.

সত্তর থেকে আশিতেই যদি দেখি সবচেয়ে বড়ো রূপান্তর বাঙালি মেয়ের সৌন্দর্য চেতনায়, সাজের সঙ্গে তার

সম্পর্ক রচনায়, তাহলে এই প্রশ্নটা উঠেই পড়ে, যে রুটিনবদলের জন্য দায়ী কে বাবা কারা? কোন প্রযুক্তিসম্পর্কই বা, উড়ে এসে জুড়ে বসল, আর বদলে দিল ফ্যাশনে বাঙালিনীর অংশগ্রহণের পদ্ধতি বা রীতি?

সুনীল - সমরেশের নির্মিত সাহিত্যের প্রেক্ষিতে, আগেই দেখেছি যে মেয়েদের বেশি সাহজগোজটাকে উদারভাবে নিতে বেশ ব্যথা ছিল কোথাও। উদাহরণ দীর্ঘতর না করেই বলা যায়, ভালো-খারাপ, পিশাচিনী -মাতৃমূর্তির দ্বন্দ্বে, সাজ-না-করা সহজসুন্দরীরাই ছিলেন মনপসন্দ। ষাটের দশকের শেষতক ফ্যাশন বাঙালির নিজস্ব মুদ্রায় এক ট্যাবু শব্দ। একদিকে বামপন্থী চিন্তাধারা, পার্টিশন পরবর্তী দুঃখী কেজো মেয়েদের লড়াকু সত্তা, এর সঙ্গেও ঠিকঠাক যেত কেজো আটপৌরে সাদাসিধে পোশাক, প্রসাধনহীনতা।

পশ্চিমঘেঁষা পোশাকের প্রতি মূলধারার ঈষৎ পক্ষপাতদুষ্ট তির্যক দৃষ্টিটা থেকেই যাচ্ছিল তাই। ফ্যাশনদস্তুর হওয়াটা খুব হাতে গোনা কয়েকজনের সাহসী পদক্ষেপের ব্যাপার। অথবা বাবার মোটা ব্যাঙ্ক ব্যালান্সের সঙ্গে সমার্থক। যেমন সিনেমায় প্রতিফলিত অপর্ণা সেনের পার্সোনা, রাতের রজনীগন্ধা অথবা বসন্ত বিলাপের প্যান্ট-টপ পরিহিতা স্মার্ট লুক, তখনও আপামর বাঙালির ভুরু তুলে দেখার উপযোগী এক সাময়িক বিলাসিতা... আমি মিস ক্যালকাটা নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স-এর চটুলতায় শেষ-মেষ পর্যবসিত।

এই ফ্যাশন দুষ্প্রাপ্যতা, ফ্যাশনেবলদের স্বল্পতা বা মাইনরিটি স্যাটাস ঘুচিয়ে দেবে দ্য গ্রেট লেভেলার, টিভি। দূরদর্শন বোধ হয় ৭০ দশক থেকে ২০১১ অব্দি বাঙালি মেয়েদের রুচি-ফ্যাশনের হালহকিকত পালটাতে একেবারে অব্যর্থ অনুঘটকের কাজ করেছে। মনে রাখব এই তথ্য যে, ১৯৭৫ সালে সবে কলকাতা দূরদর্শনের অবতরণ, মধ্যবিত্ত জীবনের বলয়ে। তারপর দশকে দশকে রূপবদলে বদলে কেবল টিভি, ডিশ অ্যান্টেনা এবং শেষ ইন্টারনেট-কম্পিউটারের হাত ধরে রুচির ছক বলে দিতে স্ক্রিপ্ট রাইটার হিসেবে অবতীর্ণ হচ্ছেন প্রথমে অ্যালালগ পরে ডিজিটাল মিডিয়া... পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনগুলি সবই থাকছে, তাদের বিশেষ ভূমিকা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশই নেই। ওই পরিবর্তনগুলিকে চিহ্নিত করতে বা শনাক্ত করতেই সাহায্য করেছে এই ছোটো ছোটো লক্ষণাক্রান্ত টিভি শো-গুলির ইতিহাস... ফ্যাশন স্টেটমেন্টে যারা অগ্রণী।

যদি বলি, ৭০-এর দশকে বাঙালিনীকে সাজতে শেখালেন দুই রমণী। চৈতালি দাশগুপ্ত আর শাশ্বতী গুহঠাকুরতা? শুনতে খুবই কি অতিসরলীকৃত শোনাচ্ছে? শাড়ি পরিহিতা বাঙালি মেয়ের মডেলে চুলে ফুল, লম্বা হাতা ব্লাউজ এবং চওড়া পাড় দক্ষিণী সুতি বা সিল্কের শাড়ি ঘরানা সম্বন্ধে চৈতালি নিজেই কদিন আগের এক টিভি ইন্টারভিউতে জানালেন। বললেন, আমাদের দুই বোন ভাবত অনেকে, আমরাও প্ল্যান করে এইরকম শাড়ি পরতাম। ফ্যাশনকে জনমানসে প্রথমে জানান দেওয়া তারপর গ্রহণীয় করে তোলা তারপর তাকে বিধিবদ্ধ, স্বতঃসিদ্ধপ্রায় করে তুলেছেন নিজেদের রুচিসম্মত কিছুটা 'শান্তিনিকেতনী' সাজ, ওই দুই নারী, বারংবার মধ্যবিত্তের নাগালে চক্ষুপথে নিজেদের বার বার উপস্থিত করে, তারপর সেই পথে একেবারে মধ্যবিত্ত বাঙালির মানসপটেই নিজদের বিধৃত করে। যে কাজ অবলীলায় ঘটে গেছে, কোনো প্ররোচনা ছাড়াই।

এর পর পর 'সানন্দা' পত্রিকার ফ্যাশন পাতা আমাদের বেশ কিছুদিন শাসন করবে, শেখাবে আটপৌরে অথচ রুচিশীল সাজের নতুন ভাষা, যা আশি ও নব্বইকে প্রায় অধিকার করে রাখবে। বাঙালি চেটে নেবে দক্ষিণাপণের নানা রাজ্যিক এথনিক কাপড়চোপড়ের স্বাদ, উড়িষ্যা রাজস্থান গুজরাটের ছাপ ছোপ ইক্কতের অ আ খ খ শিখে আপ টু ডেট হবে... সঙ্গে উঠে আসবে অ্যাক্সেসরির মতো কঠিন শব্দের জলভাত উদাহরণ, সম্বলপুরী শাড়ির সঙ্গে রুপোর গয়না চলে, গুর্জরী ছাপার শাড়ির সঙ্গে পুঁতির। মাটি দিয়ে তৈরি শান্তিনিকেতনী গয়নার এক অদ্ভুত জনপ্রিয়তা দেখব। যা কিছু ডিফারেন্ট তাই মেনস্ট্রিম হয়ে উঠবে। কিছুদিন পরে বিরক্তিকর হয়ে যাবে কাঁথা স্টিচের নতুনত্ব অথবা বালুচরীর দেখনদারি সুতোর কাজের ভার। এইসব ফ্যাশনের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে আমাদের মতো অনেক মেয়েরই বয়েস বাড়বে, কিন্তু সাজ কমবে না। বরঞ্চ হাতে আর একটু কাঁচা টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রয়োগও ক্রমশ বেড়েই চলবে।

যে মা-মাসিরা চল্লিশ পেরোলেই হালকা রং, সাদা বা ম্যাটমেটে খোলের শাড়িতে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে প্রৌঢ়ত্বের স্বর্গে সসম্মানে উত্তরণ করতেন, তাঁরা অবলুপ্ত হয়ে যাবেন, থাকবেন শুধু যৌবন ছাড়তে না চাওয়া ল্যাকমে-নির্ভর নতুন মা-আন্টি গোষ্ঠী। 'আমার মা সব জানে' পড়া জিকে-তাড়িত মায়েরা ও আন্টিরা, খাদ্য-পানীয়ের আঠাশটি পুষ্টিগুণের বিস্তারিত বিবরণ ঠোঁটস্থ করা মায়েরা ও আন্টিরা, অ্যাগ্রেসিভ, ঘরে-বাইরে সমানতালে কাজ দেখানো, অথবা ঘরের ভেতরটাকে আমূল পালটে দিয়ে বাইরের মতো করে তোলা পালিশমারা চিরযৌবনারা। মধ্যবয়সিনী, প্রৌঢ়া, এই শব্দগুলিকে তুড়ি মেয়ে উড়িয়ে দেওয়া যাদের বাঁয়ে হাত কা খেল...।

আসলে আশির দশক আমাদের দিয়েছে আমেরিকা থেকে আমদানি হওয়া নারীবাদ ও বিউটি ম্যাগাজিন, দুইই। আর দিয়েছে, মধ্যবিত্তের পাড়ায় পাড়ায় বিউটি পার্লার, লিপস্টিকের সর্বত্রগামিতা। আর, তার পর-পরই নব্বই দিল তসলিমা নাসরিনের আনন্দ পুরস্কারধন্য ব্র্যানডেড নারীবাদ, বিদেশ থেকে আসা কিন্তু বাংলাদেশের মাটিতে সৃজন করা, একবার এখানকার জলহাওয়ায় পাতন করে দেওয়া, তাই বিশুদ্ধ, নারীবাদ। হিন্দু মুসলিম আদি দিশির ধর্মে সঙ্গে মিলিয়ে পড়ে নেওয়া এই নারীবাদের ঢেউ এসেছিল, পাশাপাশি দু-চারটি অন্য ঘটনার সঙ্গে। মনমোহন ইকনমিক্স, লিবারালাইজড অর্থনীতির হাতছানি, আমাদের কাছে খুলে দিল নানা পশরার ধারা। নব্বই

আমাদের মতো মধ্যবিত্ত মেয়েদের কাছে সহজতর করল এসটিডি বুথের সাহচর্যে দূরভাষী প্রেম, আনল পোশাকে সালোয়ার কামিজের গ্রহণীয়তা, বাসে ট্রামে সাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে চলাফেরার যোগ্যতাসহ। ভুলে গেলে চলবে না, এই নব্বই আমাদের দিয়েছে কিছু প্রোডাক্ট, ওয়াশিং মেশিন অথবা মাইক্রোওয়েভের স্বাধীনতারও আগে। তার একটা অবশ্য উল্লেখ্য। শুনতে অদ্ভুত লাগলেও একেবারে অনস্বীকাযত এক বিপ্লব এনেছে স্যানিটারি ন্যাপকিনের শুষ্কতার বহুলপ্রাপ্যতা। স্মল ইজ বিউটিফুল নিয়ম মেনে আর এনেছে সহজে ব্যবহার্য এক টাকা দু-টাকার পাউচে সর্বজনের আয়ত্তাধীন শ্যাম্পু। ভুললে চলবে না, গরম গরম ফেমিনিস্ট ভাষণের একইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কন্যভ্রূণ হত্যার জন্য লিঙ্গ নির্ধারণের ক্লিনিকেরা, পাশাপাশি সৌন্দর্য রক্ষায় প্ল্যাস্টিক সার্জারি, নানা ধরনের স্কিন ট্রিটমেন্টের ক্লিনিকগুলোও ব্যাঙের ছাতার মতো।

পণ্যায়ন আর বিশ্বায়নের ঢেউ কুড়ি বছরের দেরিতে মার্কিন নারীবাদকে নিজস্ব বয়ানে আনল এ বঙ্গে, ব্রেসিয়ার পোড়ানোর বদলে যারা ব্রেসিয়ারের সেল দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ...সবার সামনে বিনা দ্বিধায়!

৬. বিজ্ঞাপনের নারী, পুরুষসাপেক্ষে

"If women are differentiated only by superficial physical attributes, Men apper more individul and irreplaceable than they really are."
-Shulamith Firestone, The Dialectic of Sex: The Case for Feminist Revolution.

মেয়েদের জামাকাপড় পরা, তার নান্দনিক বোধ, নিজেকে কাম্য করে তোলা, আয়নার সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে প্রসাধন, যা যে কোনো পুরুষের রসিকতার বিষয়বস্তুও বটে, আসলে কার জন্য? এক কাল্পনিক মেল গেজ মেয়েদের তাড়া করে ফেরে নির্জন ঘরেও, এমনটাই কি? মেয়েরা সাজে আসলে পুরুষদের মনোরঞ্জনের জন্য, না কি নিজের জন্যও?

আমার মতো সত্তর থেকে আশির দিকে যেতে যেতে পথে মেয়েদের এই কাল্পনিক গেজ বা দৃষ্টির, নিজের নারী সত্তার সঙ্গে একাত্মতা বোধ অথবা বিচ্ছিন্নতা বোধের, কিছু তফাত ঘটে গেছে। এই বদলটা যে ঘটেছে, তার প্রমাণ হিসেবে কী তথ্য খাড়া করতে পারব আমি? সহায়তা নেওয়া যাক আর এক মূল্যবান সময়-দলিলের, যার নাম বিজ্ঞাপন।

ষাটের দশকের শেষ দিকে, সত্তরের শুরু থেকে, প্রিন্ট বিজ্ঞাপনের ঘরানাকে যদি লক্ষ করি, দেখব কী অসম্ভব পুরুষ প্রাধান্য প্রায় প্রতিটি তথাকথিত 'ফ্যাশনেবল' বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে। শিশু-পরিপাকযন্ত্রের সুবিধার্থে গ্রাইপ ওয়াটার বা বেবিফুডের বিজ্ঞাপন বা ললিতাজি-সমৃদ্ধ সার্ফ সাবান বাদ দিলে, প্রায় সব বিজ্ঞাপনের উদ্দিষ্ট ক্রেতামণ্ডলী আসলে পুরুষ, দাড়ি কামাবার ব্লেড, স্যুটিং শার্টিং এবং সিগারেট, এই তিনটি ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি মনে পড়ার মতো বিজ্ঞাপনগুলো তৈরি হয়েছে এবং সব ক্ষেত্রেই এক পুরুষের দীর্ঘ ছায়ার পেছনে বিরাজ করছেন একটি বা একাধিক নারী। বসে থাকা, শুয়ে থাকা, গিটার হাতে, চুল খোলা, স্লিভলেস ব্লাউজ পরা, জিনস টপ পরা, হাতে দেশলাই, হাতে ড্রিংকসের গেলাস... এই নারীর ভূমিকা সঙ্গদায়িনী, মস্তিসহচরী, দেশলাই এগিয়ে দেওয়া তাম্বুলকরংকবাহিনীর তো বটেই, অধিকাংশ সময়েই খোলাখুলিভাবে অঙ্কশায়িনীও বটে। এভাবেই সিগারেট বিজ্ঞাপনগুলি, কী ওদেশে কী এদেশে, খোলাখুলিভাবেই পৌরুষ উদযাপন করে। এবং নারীর মূল্য সেখানে মহার্ঘ আসবাব, সিগারেট, ফ্যাশনেবল গাড়ির মতোই আর এক ভোগ্যপণ্য। এইসব ক্ষেত্রে সচরাচর কপি বা ক্যাচলাইন জুড়ে কেবল এই পুরুষকেন্দ্রিক, অতি লিঙ্গবাদী একপেশেমির তুল্যমূল্য অনুভূতিই, প্রকাশ পেত... চার্মিনারের নীচের এই অ্যাডটির কপি যার নির্যাস বলা যেতে পারে—

Give me a bike
Give me a highway
Give me my Girl
And give me the taste of toasted tobacco

রিজেন্ট সিগারেটের অ্যাডে শায়িতা নারীর উপরে ঝুঁকে পড়া পুরুষের হাতের সিগারেট, ক্যাচলাইন, 'অ্যান এক্সক্লুসিভ অ্যাফেয়ার', বলে দিচ্ছে, যৌনতার মশলা কীভাবে পরতে পরতে জড়িয়ে থাকত যে কোনো ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপনকে। আর এই যৌনতা খুবই পুরুষকেন্দ্রিক, মেয়েদের প্রায় কোনো মূল্যই এখানে নেই।

আশির দশক থেকে এই ছবিটা পালটাতে শুরু করে। আশির দশকের বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে হিট-টি বোধ হয় প্রথম পুরুষ উদ্দিষ্ট অ্যাডের ঘরানা থেকে বেরিয়ে পড়ল নিজেরই অজান্তে। লিরিল-এর সেই মেয়েটিকে মনে করুন। ঝর্নার জলে স্নানরত সবুজ বিকিনি পরা সেই সুন্দরীর স্নানোচ্ছলতার ভেতরে এমন এক আত্ম-সুখ ছিল যার আবেদন পুরুষ নারী নির্বিশেষে ধরা গেছে। 'Come alive with freshness' সরাসরি এই আবেদন কিন্তু যৌনতা বর্জিত বয়ান। আর, মেয়েটির সঙ্গে লক্ষণীয়ভাবেই কোনো পুরুষ ছিল না, সে একা একাই ঝর্নায় স্নান করে চলেছে, বহুক্ষণ ধরে। লিরিল সাবান প্রথম দেখালো, মেয়েরা একলা একলাও 'এনজয়' করতে পারে। পারে ওই অ্যাড-এর নির্মাতার এক সাক্ষাৎকারে পড়েছিলাম, প্রতিটি মহিলাই আসলে নিজের বন্ধ স্নানঘরে মনে মনে এভাবেই ঝর্নাস্নানের স্বপ্ন দেখেন।

সেই স্বপ্নকল্পনাকে বিষয় করে এগিয়ে এত হিট আশি দশকের এই অ্যাড।

আশির বিজ্ঞাপনে মেয়েদের চুল, মেয়েদের ক্রিম, মেয়েদের পাউডারের রমরমা, বিজ্ঞাপনে কেবলি নারীর নিজ উদযাপন, তাকে আর পুরুষ সঙ্গিনী করে দেখানো হচ্ছে না। পরিবারের ভালোর জন্য চিন্তাকুল বধূমাতা হিসেবেও নয়। অথবা জামাকাপড়ের বিজ্ঞাপনে দুই মহিলার ছবির সঙ্গে ক্যাচলাইন, 'এ ওয়োম্যান এক্সপ্রেসেস হারসেলফ ইন মেনি ল্যাংগুয়েজেস' যা সত্তরের ওই শ্যুটিং -এর বিজ্ঞাপনের ম্যাচো পুরুষের (ক্যাচলাইনে 'দ্য আলটিমেট ম্যান' বা 'দ্য ম্যান ইন দ্য পোদার স্যুট') ছবি থেকে অনেক বড়ো এক সরে আসা। কিউটেক্স-এর নেলপালিশ লাগানো হাতের মেয়েটির (যা কেবলি এক নারী-উদ্দিষ্ট প্রোডাক্ট) মতো গলা জড়িয়ে ধরা উপযোগী একটি পুরুষের প্রয়োজনীয়তা এইসব বিজ্ঞাপনে আর নেই।

বাংলার বাজারে কী ঘটল? এর আগে অব্দি, নিছক মেয়েদের জন্য, মেয়েদের উদ্দিষ্ট ক্রেতা হিসেবে বিজ্ঞাপন, হয়তো ফেমিনা-র মতো এক আধটি ইংরেজি কাগজের একচেটিয়া হলেও, বাংলায় মেয়েদের পণ্যের ভোক্তা হিসেবে তৈরি বিজ্ঞাপনের রমরমা সে অর্থে শুরু হল আশির দশকেই। বলতেই পারেন। কেউ, এ তো মূলত পুরষতন্ত্রকে জীবিত রাখার তাগিদে, পুরুষের কাছে মেয়েদের কাম্য ও আরও বেশি ভোগ্য করে তোলা তার একটা অ্যাজেন্ডা। অবশ্যই। তবু, মেয়েদের দৃষ্টি মেয়েদের উপরে পড়তে শুরু করেছে সে অর্থ, সানন্দা ধরনের বাংলা পত্র-পত্রিকার দৌলতেই।

যেখানে যেখানেই আস্তে আস্তে পালটে গেছে গেজ বা দৃষ্টিকোণ, সেখানেই তীব্র হয়েছে বদলের রাজনীতি, নিজের অজান্তে, কেবল পুরুষের ভোগ্য থেকে নারী হয়ে উঠেছেন। নিজেই নিজের বাসনায় বিষয়, যা অবশ্যই একটা মূলগত তফাৎ। শুলামিথ ফায়ারস্টোন বলবেন, ''Thus her whole indentity hangs in the balance of her love life. She is allowed to love herself only if a man finds her worthy of love.'' ঠিক এই জায়গা থেকে আর কে নারীবাদী নেওমি উলফ, যিনি লিখেছিলেন দ্য বিউটি মিথ-এর মতো সাড়াজাগানো বই, বলেছিলেন, Women who love themselves are threatening।

যে বিজ্ঞাপনে দেখি নিজেকে ভালোবাসতে এই প্রথম শিখছে মেয়েরা, যে মুহূর্তে একজন পুরুষ, তার ভালোবাসা (পড়ুন কাম ও অধিকার) নিয়ে বিদায় নিচ্ছেন জীবন থেকে, সেই মুহূর্তে অসৌন্দর্যের গর্তে পড়ে যাচ্ছেন না মেয়েরা... বিধবা বা অবিবাহিতরা ভালো সাজার, ভালো জামাকাপড় পরার অধিকার নেই, আয়নায় নিজের মুখ দেখাও অপ্রয়োজনীয়, এই অনুভূতি চলে গিয়ে আসছে আত্মপ্রেম আর আত্ম আবিষ্কারের প্রবণতা। যা অবশ্যই আসছে পণ্যায়নের হাত ধরে, কিন্তু মূলগতভবে বদলে দিচ্ছে কাঠামোটা।

৭. ২০০০-পরবর্তী কোলাহলে - কোহলে

''For I conclude that enemy is not lipstick, but guilt itself, that we deserve lipstick, if we want it, ADD free speech; we deserve to be sexual AND serious - or whatever we please.'' (Naomi Wolf)

তাহলে সবকিছুই ভালোর দিকে। দুহাজারে এসে আমরা মেয়েরা তো খুঁজেই নিয়েছি নিজেদের এই আত্ম পরিচয়, নিজেদের শীরকে নিজেরাই ভালোবেসে কবে যে জেনে গেছি, পুরুষের মনোরঞ্জন নয়, ব্যক্তিত্বময়ী, স্মার্ট, কর্মক্ষেত্রে জলচল হবার জন্যই আমাদের সাজ। নারীবাদীরা তাহলে খুশি তো?

এতটাই আত্মতৃপ্তির কিনা, জানি না, শেষ কথা বলতেও পারি না এই আশ্চর্য অনিশ্চিতিময় সমাজে দাঁড়িয়ে, রাজনীতির ক্ষেত্র, ক্ষমতার খোলার ক্ষেত্রটা যে আসলে বৃহৎ পুঁজির!

এক বন্ধু বলেছিলেন একটা অভিজ্ঞতার কথা। বছর চার পাঁচ দেশের বাইরে ছিলেন তিনি, সদ্য কলকাতায় ফিরেই প্রথম তার দুটো জিনিস চোখে পড়েছিল, এক, বাড়ির পাশেই নার্সারি স্কুলের বাচ্চাদের নিতে আসা, ঘরোয়া (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাচ্চাকে নিতে মায়েরাই আসেন ও গোল হয়ে বলে উল বোনেন বা পরচর্চা করেন বেলা এগারোটা বারোটায়, সুতরাং ধরে নেওয়া যায় এঁরা সকলেই গৃহবধূ) মায়েদের পোশাকের পরিবর্তন। জিন্স আর শর্ট টপ বা কুর্তি একদিন ২০-২৫ তরুণীদের পরিধেয় ছিল। ৩৫ প্লাস মহিলাদের খোদ দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর, যদুবাবুর বাজারের মতো প্রাচীন এলাকাগুলো দিয়ে চড়ে বেড়াতে দেখে, বাচ্চার হাত ধরে হেঁটে যেতে দেখে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছিলেন এই পুরুষ বন্ধু। যার স্মৃতিতে রয়ে গেছে নিজের মা মাসি কাকিমা, তারপর বৌদিদের শাড়ি পরা মূর্তিগুলো, অথবা বান্ধবী, গিন্নি অথবা বয়সে ছোটো মেয়েদের সালোয়ার কামিজ পরিহিত চেহারা।

দু হাজারের পর পরই বোধ হয়, কলকাতা বা শহরতলিগুলোতে দেখা যায়, প্রচুর বুটিক আর গিফট শপ, বিউটি পার্লার আর টেলারিং-এর দোকানের পাশাপাশিই এক নতুন মহিলা গোষ্ঠী, যাদের বয়সে বা সামাজিক অবস্থান তাদের বৌদি বা মাসিমা ডাকের যোগ্য করে তোলে, অথচ সাজের ভেতরে থাকে তরুণী নারীর সাবলীলতা, হরিণীসুলভ চঞ্চলতা। টানটান চপল চেহারা এঁদের, ছেলের হাত ধরে স্কুল থেকে ফেরার সময় এরা বুকে টেনে নেন না কামিজের চুন্নি। বরঞ্চ নিরাবরণ কুর্তির কাটাকাটা রেখায় এঁদের পেলবতা উধাও। আর মেদময় মধ্যপ্রদেশের সেই ট্র্যাডিশন কোথা উবে গেল? কোথায় গেলেন ভারিক্কি, যৌবনের অপরাহ্নের হেলে আসা ছায়ায় ভরভরন্ত গোলগাল শাড়ি পরিহিতরা, অথবা সালোয়ার কামিজে কেজো, জাঁদরেল, খান্ডারানিরা, একদা যে চেহারাকে দিল্লিওয়ালি, পাঞ্জাবি

মহিলাদের সঙ্গে আইডেন্টিফাই করা হত?

দ্বিতীয় যে পরিবর্তনটা লক্ষ করেছিল আমরা বন্ধু, সেটা হল, প্রতি ছ-সাত স্টপ অন্তরই কলকাতার ভূগোল যোগ হয়েছে এক একটি নতুন নামের বাস স্টপ, নতুন পাড়া, নতুন এলাকা... এক ঝাঁক অ্যাপার্টমেন্ট অথবা এককথায় দেওয়ালঘেরা 'সিটি'রা আকাশ ছুঁইয়ে প্রায় মাথা তুলেছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত রংঢং নিয়ে, এসির ঠাণ্ডা হাওয়া আর ফ্রেশনারের তাজা গন্ধ নিয়ে যেটি যোগ হয়েছে কলকাতার স্কাইলাইনে, ধ্যাবড়া ও বিশাল এক একটি বাড়ি, যার নাম শপিং মল বা সুপারমার্কেট। যারা প্রায় ঢেকে দিয়েছে আমাদের আগেকার ওই পাড়ার দোকান, কাটরা, দর্জি-ঘর, তথাকথিত রেডিমেড স্টোর আর কাপড়ের আড়তগুলোকে!

বলাই বাহুল্য, বন্ধুর এই দুখানা পর্যবেক্ষণের ভেতর কোথাও একটা যোগসূত্রও পাব, একটু খুঁজলেই! সে যোগসূত্র হল, এই তথ্যের যে একদা যে কুর্তি ছিল ১৭-১৮ বছর বয়সীদের পরিধেয়, XL XXL ইত্যাদির কল্যাণে সেই কুর্তি এখন অঙ্গে চড়াবার যোগ্য ৩৫ উর্ধা মহিলাদেরও। আর আকাশ ছোঁওয়া বাড়ির বড়ো বড়ো দেওয়াল জোড়া বিজ্ঞাপনে এমনই আগ্রাসী এই নতুন ইন্দো-ওয়েস্টার্ন ফ্যাশন-বিকল্প, ওপর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া বোমার মতো নব নব সামার বা উইন্টার সেলের হাতছানি এতটাই প্রভাবশালী এক মোহবলয় সৃষ্টি করেছে মেয়েদের সব বয়েসীদের ওপরে, যে সকলেই পরে ফেলেছেন ছাপছোপ দেওয়া, নিশ্চিতভাবেই নান্দনিক, আর, যেটা বলবার কথা, 'কাজের খুব সুবিধে' করে দেওয়া এইসব পোশাক। বলাই বাহুল্য বৃহৎ পুঁজির কর্মকৌশল সব কিছুকে এক মাপে কাটার পাশাপাশিই, জামাকাপড়ের মাস প্রোডাকশনে এনে ফেলেছে একই ডিজাইনের পোশাক, নানা মাপে।

আর একটা ট্রেন্ড ফ্যাশনের বলয়ের ভেতরে টেনে এনেছেন সব বয়সিনীদের, পুরুষদেরও। টিভি যদি বা ৭০ দশক থেকেই ছিল, নতুন ডিশ অ্যান্টেনা বিপ্লবের রমরমায় একঝাঁক হিন্দি সাঁস-বহু সিরিয়াল, আর তার ক্লোন বাংলা সিরিয়াল, অবশ্যই জি টিভি ও স্টার টিভির মতো বাঘা চ্যানেল-গোষ্ঠীর আর্থিক মদতে পুষ্ট হয়ে, তাদের সর্বাতিশায়ী ছায়া ফেলেছে আমাদের শোবার ঘর পর্যন্ত। জরি চুমকি পাথর বসানো শিফন বা ক্রেপের চিকিমিকি ছায়া। এই ছায়ার বলয়ে এমন অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ভারতীয়। বাঙালির ফ্যাশন বলে আলাদা কিছুই থাকছে না আর। আর আছে প্রতি বছর পুজোর হিড়িকে নতুন ফ্যাশন ট্রেন্ড তৈরিতে সিদ্ধহস্ত বিগ হাউজ ডিজাইনাররা। সব্যসাচী আদি নানা গুরুর ফ্যাশন এখন জলভাত। ফ্যাশন এখন রোজকার জীবনশৈলী। প্রতিটি অঙ্গের ফ্যাশন আলাদা আলাদা করে বিবেচ্য হয়েছে, শুধু পোশাক আশাকের ব্যাপার নয় এটা আর। ভুরু থেকে নাভিমূল, কোমর থেকে পায়ের পাতা অব্দি এক বাণিজ্যক্ষেত্র এটা এখন। চুলের হাইলাইটিং, হেয়ার কালারের বহুস্তরীয় আক্রমণ, আর পার্ম করা বা স্ট্রেটেন করা চুলের আশ্চর্য টেকনোলজি এসেছে যেমন আজ, ছোটো ছোটো আংটায় ভরে গেছে কানের লতি, নাকে পাটা থেকে নাভির চামড়া অব্দি।

হয়তো আসছে কিম কি ডুকের ছবি টাইম-এর মতো ভয়াবহ এক দিন, যখন ক্রমাগত প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে নিজের মুখ পালটে নিতেও অভ্যস্ত হয়ে যাবেন এইসব ফ্যাশন-অনুগামিনীরা। সবার মুখ এক ছাঁদে, এক মাপে কাটা হয়ে উঠবে ক্রমশ, আর পালিশ করা চুলের, ইস্তিরি করা চুলের ছাঁটগুলো থেকে ক্রমশই আর চিনে ওঠা যাবে না কে শ্রীমতি এক্স বা শ্রীমতি ওয়াই-ই বা কে।

তবু, আশার কথা একটাই। এখনও একটা দৃশ্য মোটামুটি একই আছে আমাদের এই পোড়া ভারতের পোড়া বাংলায়। সকালবেলা বারাকপুর বসিরহাট বা ক্যানিং থেকে আসা বউঝিরা ট্রেন থেকে নেমে দলে দলে যখন অধিগ্রহণ করেন কলকাতা শহরের পথঘাট, তাঁদের চেহারায় নতুন করে ঝলসে উঠতে দেখি ফ্যাশনের শেষ কথা, সেপ্টিপিনে আটকানো ব্লাউজের ভেতরে গুঁজে রাখা টাকার ছোটো পুঁটলি বা ব্যাগ আর ছাপার বা সস্তা সিন্থেটিক শাড়ি এলোমেলো ভাঁজে। সত্যিকারের ট্রেন্ড যদি আসে, তা আসবে ওইখানে। ওদের কত শতাংশ সালোয়ার কামিজের মতো 'কার্যকর পোশাকে' উত্তীর্ণ হয়েছেন? সেই পরিসংখ্যান নেবার সময় বোধ হয় এখনও আসেনি।